দল নির্বাচনের গোলকধাঁধা

লিখেছেন **সাইদুজ্জামান**

একটা সময় ছিলো, যখন দল নির্বাচনের মূল ভূমিকা পালন করতেন প্রভাবশালী ক্রিকেটাররা। 'অমুককে খেলাতে হবে, নয়ত আমি খেলব না', বলে জাতীয় ক্রিকেট দলে নিজের প্রিয়ভাজনকে ঢোকানোর উদাহরণ আছে। তেমনি 'ওকে নিলে আমি খেলবো না' এমন উদাহরণও আছে। 'ফেবারিটিজম'-এর সেই যুগ আর নেই। এটা জেনে মনে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নির্বাচন বোধহয় এখন ত্রুটিমুক্ত। কিন্তু আদতে তা নয়। আজ একজনকে নেয়া হলো, তো কালই তাকে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পেশাদারিত্বের নামে দলের খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস শুষে নেয়া হচ্ছে। আবার কোন কন্ডিশনে কাকে খেলানো যায়, সেটা নির্বাচকরা একদমই ভাবেন না বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাতে টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নিয়ে যেমন বিতর্ক হতো, তা এখন বেড়েছে বৈ কমেনি।

এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্যানেল। মাঈনুল হক মাঈনু ঐ প্যানেলের প্রধান। তার দুই সহযোগী হলেন আসাদুজ্জামান মিশা ও ফারুক আহমেদ। সর্বশেষ একটি ঘটনায় দল নির্বাচনে এই তিনজনের একচ্ছত্র ভূমিকা নিয়ে পুরনো সন্দেহ সত্যি বলে মনে হচ্ছে। কেনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে তিন দিনের ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন বাংলাদেশ 'এ' দলের অধিনায়ক সানোয়ার হোসেন। সেই খবর শুনে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি আলী আজগার লবীর দ্রুত অনুধাবন জানিয়েছে জাতীয় দৈনিক যুগান্তর (২০ আগস্ট, ২০০২) সানোয়ারকে জাতীয় দলে নেয়ার নির্দেশ দিলেন বিসিবি সভাপতি। আগামী মাসে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ইতিমধ্যে দল ঘোষণা হয়ে গেছে। তাতে সানোয়ার নেই। আর এখন নেয়ার সুযোগও নেই। তবে মাঈনু অ্যান্ড কোং একটা ম্যাসেজ পেয়ে গেছেন যে, অক্টোবরে জাতীয় দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সানোয়ারকে রাখতেই হবে।

দেশের ক্রিকেটের ভালো-মন্দ দেখার প্রধান দায়িত্ব নিঃসন্দেহে বোর্ড প্রেসিডেন্টের। সানোয়ারকে জাতীয় দলে নেয়ার ঘোষণা দিয়ে সেই দায়িত্বই হয়তো পালন করতে চেয়েছেন আলী আজগার লবী। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাতীয় দল নির্বাচনের জন্য তো স্বতন্ত্র একটি প্যানেল আছে। আর এমন প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে কি নির্বাচকদের একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলে দিলেন না তিনি? সেটাও না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু আজ সানোয়ারের ওপর লবী আস্থা রাখলেন, তা কতদিন বহাল থাকবে? একজনকে দলে নিয়ে তাকে সহসাই ছুঁড়ে ফেলার অজস্র উদাহরণ আছে বলেই এমন সন্দেহ। সানোয়ারই তার একটি। গত বছর 'এ' দলের হয়ে ভারত সফরে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় দলে ফিরেছিলেন সানোয়ার। কিন্তু জিম্বাবুইয়ের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে প্রত্যাশা না মেটাতে পারায় আবারও বাদ পড়েন এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। একটা সিরিজ দেখেই নির্বাচকরা বুঝে গেলেন যে, সানোয়ার 'চলে না'। অথচ তারাই দলে নিয়েছিলেন সানোয়ারকে।

তবে সুখবর হলো, আশাহত হননি সানোয়ার। জাতীয় দলে ফেরার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। মোটামুটি সফল সেই সংগ্রামের পর জাতীয় দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাও যাবেন। তবে তিনি কি আরেকবার জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার শঙ্কা মন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন? সম্ভবত কেন, অবশ্যই নয়। নির্বাচকরা তাও আস্থা হারানো জন্য হলেও ক্রিকেটারদের ওপর মাঝেমধ্যে আস্থা রাখেন। কিন্তু ক্রিকেটাররা কখনোই নির্বাচকদের ওপর আস্থাশীল নন। তারা আস্থা রাখবেন কি করে? প্রথমবার দলে ডাক পাওয়া ট্যুর শুরুর আগে নির্বাচকরা অনেক ভালো

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি আলী আজগার লবী

দেশের ক্রিকেটের ভালো-মন্দ দেখার প্রধান দায়িত্ব নিঃসন্দেহে বোর্ড প্রেসিডেন্টের। সানোয়ারকে জাতীয় দলে নেয়ার ঘোষণা দিয়ে সেই দায়িত্বই হয়তো পালন করতে চেয়েছেন আলী আজগার লবী। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাতীয় দল নির্বাচনের জন্য তো স্বতন্ত্র একটি প্যানেল আছে। আর এমন প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে কি নির্বাচকদের একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলে দিলেন না তিনি? সেটাও না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু আজ সানোয়ারের ওপর লবী আস্থা রাখলেন, তা কতদিন বহাল থাকবে?

ভালো কথা শোনান, 'তোমাকে অনেক আশা নিয়ে দলে ডেকেছি। তোমার মাঝে প্রতিভা আছে। তুমি পারবে ইত্যাদি ইত্যাদি।' আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেকে হয়ত ঐ তরুণ কিছু করতে পারলো না। তখন ঐ নির্বাচকরাই সার্টিফিকেট দেবেন, 'চলে না'। তাতে ঐ তরুণের হৃদস্পন্দন না চললেও ক্ষতি নেই নির্বাচকদের। কিছুদিন বিরতির পর ঐ তরুণ আবার ঘরোয়া আসরে ভালো কিছু করলে একই নির্বাচকরা দলে নেবেন তাকে। আবার বাদও দেবেন। খালেদ মাহমুদ সুজন, মোহাম্মদ রফিক, নাইমুর রহমান দুর্জয়রা এই যাওয়া-আসা করতে করতে হয়রান। এখন এই তালিকায় যোগ হলো সানোয়ার, হান্নান সরকার ও এহসানুল হক সিজানের নাম। আরও অনেকে আছেন অপেক্ষমাণদের দলে।

নির্বাচকদের এই অস্থিরতার পেছনে অন্য এক কাহিনীও আছে। সেটা হলো জাতীয় দল নির্বাচনে বিদেশী কোচদের হস্তক্ষেপ। বিপুল ডলারের বিনিময়ে একজন কোচ আনার পেছনে যুক্তি হলো, তাকে দিয়ে ক্রিকেট দলের উন্নতিতে যতটা সম্ভব কাজ করিয়ে নেয়া। আর সেটা করতে গিয়ে বিদেশী কোচের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লম্বা একটা ঘুম দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ভাবটা এমন, উনি তো আছেন। আমাদের আর জেগে কি লাভ! টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তির পর অস্ট্রেলিয়ার ট্রেভর চ্যাপেলের ওপর সব দায় ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলো বিসিবি। চুক্তি শেষে হিসাব মিলিয়ে দেখা গেল ফলাফল শূন্য। অগত্যা ট্রেভরকে ছুঁড়ে ফেলা হলো। কারও দক্ষতা যাচাইয়ের কাজ না পারলেও তার পদচ্যুতিতে ওস্তাদ বিসিবি।

এলেন মোহসীন কামাল ও আলী জিয়া। একই উপমহাদেশের বলেই হয়তো বাংলাদেশের 'নার্ভটা' আগেভাগেই জানা এই দুই পাকিস্তানির। উপমহাদেশে সিনিয়র ক্রিকেটাররা কথা ঠিকমতো শুনতে চায় না, এই ধারণা থেকে অ্যাসাইনমেন্টের শুরু থেকেই অভিজ্ঞদের পেছনে লেগেছেন এই দু'জন। 'তোমরা বুড়ো', বলা থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ বক্তার মতো সিনিয়রদের কেরিয়ারের সীমানাও এঁকে দিয়েছেন মোহসীন-জিয়া জুটি। আর নতুন কয়েকজনের মাঝে অসাধারণ প্রতিভার সন্ধান পেলেন তারা। সেই সব তরুণের মাঝে যে প্রতিভা আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে 'অসাধারণ' বলাটা বাড়াবাড়ি। 'আসলে এসব করে সিনিয়রদের ঝেড়ে ফেলে দলের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করতে চাচ্ছেন তারা', মন্তব্য একজন সাবেক ক্রিকেটারের। তবে ভেতরের খবর হলো, আপাতত এই মিশনে ব্যর্থ হয়েছেন মহসিন-জিয়া জুটি। সদ্য সমাপ্ত শ্রীলঙ্কা সফরের শেষদিকে সিনিয়র ক্রিকেটারদের অপমান করতে গিয়ে উল্টো নাকাল হয়েছেন মহসীন কামাল। সমালোচনার পরিবর্তে এখন তাই সিনিয়র ক্রিকেটারদের প্রশংসাও করতে শুরু করেছেন তিনি।

দল নির্বাচনী সভাগুলোতেও ধীরে ধীরে কর্তৃত্ব হারাতে বসেছেন মহসীন-জিয়া জুটি। বাংলাদেশের চেয়ে ক্রিকেটে পাকিস্তান অনেক এগিয়ে, এটা নিয়ে বিতর্ক তো দূরের কথা, সন্দেহের অবকাশও নেই। তেমনি সন্দেহ নেই, মহসীন-জিয়ার চেয়ে এ দেশের ক্রিকেটারদের সামর্থ্য সম্পর্কে ভালো জানেন নির্বাচকরা। অথচ দল নির্বাচনের প্রথম সভা থেকেই ঐ দুই পাকিস্তানির চেষ্টা ছিলো কি করে নিজেদের পছন্দের ক্রিকেটারদের প্রাধান্য দেয়া যায়। বিদেশী কোচদের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ার পুরনো রীতির কারণে শুরুর দিকে সফলও হয়েছেন তারা। কিন্তু এখন আর ততটা প্রভাব ফেলতে পারছেন না। অনেকে কোচদের পক্ষ নিয়ে বলতে পারেন, দল নির্বাচনে তাদের গুরুত্ব তো দিতেই হবে। কথাটা ফুটবলের জন্য শতভাগ সঠিক হলেও ক্রিকেটের ক্ষেত্রে তা নয়। ক্রিকেটে দলীয় ব্যর্থতা অধিনায়কের ওপর বর্তায়। তাই ক্রিকেটে দল গঠনে নির্বাচকদের প্রধান সহযোগী অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার কোচ জন বুকানন নির্বাচনী নীতি নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। তাই এখন আর তিনি অস্ট্রেলিয়ার দল গঠনে ভূমিকাহীন। এটা সারেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক ও অধিনায়ক। যুবরাজ সিং, আশীষ নেহরা, জহির খানকে দলে রাখার জন্য ভারতীয় নির্বাচকদের সঙ্গে অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর বাকযুদ্ধের খবর শোনা গেছে। এই বিতর্কে একবারও উচ্চারিত হয়নি সে দেশের ক্রিকেট কোচ জন রাইটের নাম। ভারতীয়দের কাছে তিনিও কিন্তু বিদেশী। তবু তারা একটা দল বানিয়ে সেটাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয় রাইটের ওপর। আর বাংলাদেশে গোটা দেশটাকেই তুলে দেয়া হয় বিদেশী কোচের হাতে। সেটা হাতে নিয়ে মহসীন কামাল ঘোষণা দিয়েছেন, 'আমি এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ গড়ে দেব।' 'ভবিষ্যৎ' শব্দটি তিনি উচ্চারণ করেছেন 'পজিটিভ' অর্থে। তবে বাস্তবে সেটাকেই 'নেগেটিভ' মনে হচ্ছে। তার অধীনে এ পর্যন্ত যা আলামত দেখা যাচ্ছে, তাতে উত্তরণের পরিবর্তে অবনমনের সম্ভাবনাই বেশি। আর সময়কাল 'এক বছর' নিয়েও দুটো কথা আছে। মহসীন কামালের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি এক বছর মেয়াদি। অর্থাৎ এই এক বছর তিনি বেতন নেবেন এবং চেষ্টা চালাবেন। তাতে মেরে-কেটে সফল হলে চুক্তি মেয়াদ বাড়বে। আর ব্যর্থ হলে মহসীন কামালের কোনো ক্ষতি নেই। বাংলাদেশ থেকে আয় করা ডলার নিয়ে আয়েশে সময় কাটাবেন দেশে। কেননা, এই ডলার লুট করা কি না, সেই প্রশ্ন তাকে কেউ

নির্বাচকদের কারণেই বাংলাদেশ দলে স্থায়ী হতে পারছেন না সানোয়ার, রফিক ও দুর্জয়

আকরাম, বুলবুল ও মণি: ক্যারিয়ার শেষ?

জিজ্ঞাসা করবে না। মহসীন-জিয়া জুটি চলে গেলে আবারও সস্তায় কাউকে আনার জন্য নানামুখী তৎপরতা চালাবে বোর্ড। আবারও নতুন কোনো ক্রিকেট বিজ্ঞানীর (!) ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বাংলাদেশের ক্রিকেট।

বাংলাদেশ দল নির্বাচনে কোচদের ভূমিকা থাকার কারণে মহসীন কামাল ও আলী জিয়াকে নিয়ে এতোটা লিখতে হলো। আবারও নির্বাচকদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পুনরারম্ভ হোক একটি সত্য গল্প দিয়ে। পাকিস্তানি ক্রিকেটার তারেক মেহমুদের পরিচিতি ঢাকা লীগে ব্যাপক। জাতীয় দলে খেলার কোনো দিনও সুযোগ পাননি তিনি। তাতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করেন তারেক। এক মৌসুম আগে হঠাৎ উচ্ছলতার সঙ্গে জানালেন, 'দেখবেন এবার জাতীয় দলে ডাক পাব।' বলে এই আশাবাদের কারণও জানলেন, 'বোর্ডে এখন আমার লোক আছে।' তারেকের অনুজ আতাউর রেহমানের ধারণাও তাই। বোর্ডে এখন নিজের লোক নেই বলেই নাকি ম্যাচ পাতানোর দায়ে তিনি নিষিদ্ধ। জ্ঞাতব্য, ঢাকা লীগে বড় দলের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ম্যাচ ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ আছে তারেকের বিরুদ্ধেও। তো, উপমহাদেশের সবকিছুই ছোঁয়াচে বলেই হয়ত বাংলাদেশের অনেক ক্রিকেটারও বিশ্বাস করেন, বোর্ডের আশীর্বাদ থাকলে জাতীয় দলে স্থান পাকা। যাদের লোক নেই, তারা দুঃখ করেন এ নিয়ে। এই বিশ্বাস থেকেই নির্বাচকদের ওপর আস্থা আরেকটু কমেছে ক্রিকেটারদের। শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সফর শেষে দেশে ফেরা একাধিক ক্রিকেটারের সন্দেহ দল নির্বাচনে কারও প্রভাব আছে। অবশ্য এই অভিযোগ কেবল বঞ্চিতদের।

স্বভাবতই বাইরের এই চাপের কথা স্বীকার করেন না বাংলাদেশের নির্বাচকদের কেউ। 'কোড অব কন্ডাক্টের' কারণে নীরব থাকেন অধিনায়কও। ধরুন কোনো একটি নির্বাচনী সভায় একজন ক্রিকেটারকে নেয়ার বিরোধিতা করলেন প্যানেলের সিংহভাগ সদস্য। কিন্তু বাইরের চাপে তাকে নিতে হলো শেষমেশ। এরপর প্রেস কনফারেন্সে দল ঘোষণার সময় যারা বিরোধিতা করেছিলেন, তারাই ঐ ক্রিকেটারকে দলে নেয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশি যুক্তি উপস্থাপন করবেন। অধিনায়কও সায় দিয়ে বলবেন, 'এটাই এই মুহূর্তে আমাদের সেরা দল।' কিন্তু সিরিজ শুরুর পরই গুঞ্জন শোনা যাবে, 'অমুককে যে কেন দলে নেয়া হলো! আর তমুককে যে কেন দলে নেয়া হলো না!' বর্তমানে কেনিয়া সফররত 'এ' দল নির্বাচন নিয়েও তাই হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলের বিরুদ্ধে খড়কুটোর মতো উড়ে গেলেও মেনে নেবেন অনেকে। কিন্তু কেনিয়ার কাছে হার সহ্য করবে না কেউ। অনেকটা 'ইজ্জত কি সওয়াল' জাতীয় ট্যুরে যে দলটাকে পাঠালেন নির্বাচকরা, তার সমালোচনা করা যায় দিনভর। কেনিয়ার উইকেট বাউন্সি। তাই অল রাউন্ডার মুশফিকুর রহমান বাবুর পরিবর্তে জাতীয় দলের সুজনকে পাঠানোই ছিলো যুক্তিযুক্ত। বোলিং ডিপার্টমেন্টে শক্তি বৃদ্ধির জন্য সানোয়ার চেয়েছিলেন বাঁ-হাতি স্পিনার মোহাম্মদ রফিককে। নির্বাচকরা বিষয়টি প্রায় চূড়ান্তই করে ফেলেছিলেন। কিন্তু একদিনের মধ্যে এই দু'জনের জি ও (গভর্নমেন্ট অর্ডার) বের করতে না পারায় সুজন-রফিকের কেনিয়া যাওয়া হয়নি! যুক্তিটা হাস্যকর। কমনওয়েলথ গেমস ও শুভেচ্ছা সফরের নামে যেসব অ্যাথলেট ও ফুটবল দলের সদস্য বিদেশে পালিয়ে দেশের মানসম্মান ডোবায়, তাদের জিও হয় অনায়াসে। আর জাতীয় দলের দুই পরিচিত মুখকে সরকারি ছাড়পত্র দিতে এতো সতর্কতা। কি বিচিত্র এই দেশ! এই বিপত্তির কারণে কেনিয়ায় 'এ' দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ও অলোক কাপালীর মতো আরেক লেগ স্পিনার মোসাদ্দেক হোসেন রুবেল। আগেই দলে ছিলেন অফ স্পিনার সাব্বির খান। অর্থাৎ কেনিয়ার বাউন্সি উইকেটে বাংলাদেশের বোলিং অ্যাটাকে থাকবেন চার স্পিনার। এই অর্থহীন বোলিং অ্যাটাককে চাপা দিয়েই প্রথম ম্যাচে ৫১৬ রানের পাহাড় গড়ে কেনিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করা আশরাফুলকে নিয়ে তারা মেতে উঠেছেন মরণ খেলায়। বয়স ও মেধায় যেখানে সম্ভব, সব জায়গায় এই তরুণকে পাঠাতে বদ্ধপরিকর নির্বাচকরা। প্রধান নির্বাচক মাঈনুর ভাষায়, 'যত বেশি ম্যাচ খেলবে তত বেশি প্র্যাকটিস হবে।' এই অনুশীলনেরও যে একটা মাত্রা আছে, সেটা বোধহয় ভুলেই গেছেন মাঈনু। ক'দিন আগে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রিকেট অধিনায়কদের বাৎসরিক সভা। সেখানে তাদের প্রধান দাবি ছিলো আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংখ্যা কমাতে হবে। অতিরিক্ত ক্রিকেটের কারণে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছেন। তাদের এই দাবির প্রেক্ষিতে আইসিসি উদাহরণ হিসেবে একজন ক্লান্ত ক্রিকেটারকে চাইতে পারে। মোহাম্মদ আশরাফুলকে পাঠালে আরেকটি ট্যুর হয়ে যাবে তার। গত এক বছরে আশরাফুলের মতো এতো বেশি ম্যাচ সম্ভবত আর কোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার খেলেননি। আইসিসির দরবারে ক্লান্ত ক্রিকেটারের উদাহরণ বেশি ম্যাচ সম্ভবত আর কোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার খেলেননি। আইসিসির দরবারে ক্লান্ত ক্রিকেটারের উদাহরণ হিসেবে আশরাফুলের প্রস্তাবিত উপস্থিতি একটা মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে। সাফল্য যেখানে সুদূর পরাহত, তখন এভাবে আলোচনায় নাম লেখানোয় দোষ কি!